বিজ্ঞান ও ভগবান

হৃষীকেশ সেন

"পবিত্র চার্চের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে এই ভ্রান্ত মত ত্যাগ করছি যে সূর্যই কেন্দ্র এবং নিশ্চল ; এই ভ্রান্ত মতবাদ কোনওভাবেই পোষণ, সমর্থন বা প্রচার না করতে আদিষ্ট হয়ে... আমি এইসব ভ্রম ও ধর্মবিরোধী মত এবং চার্চবিরোধী অন্যসব মত ও ভ্রমকে শপথপূর্বক পরিত্যাগ করছি এবং এগুলির প্রতি শাপ ও বিদ্বেষ ঘোষণা করছি... ।"

কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে গ্যালিলিও যখন টেলিস্কোপের সাহায্যে যাচাই করলেন এবং জানালেন যে পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তখন সে যুগের খ্রিস্টীয় চার্চ তাঁকে উপরের বিবৃতিটি দিতে বাধ্য করেছিল। সেই যুগ থেকেই ইউরোপে শুরু হয়েছিল বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘর্ষ। কিন্তু কী ছিল এর পটভূমি ?

আদিম মানুষ যেদিন ছিল প্রকৃতির কোলে অসহায়, সেদিন প্রকৃতির সব খেলাই তার কাছে ছিল অলৌকিক। প্রতিনিয়ত লড়াই করে তাকে টিকে থাকতে হত। মৃত্যুর হাতছানি ছিল পদে পদে। তাই সবকিছুকেই সে ভয় করত, সবাইকেই চাইত খুশি করতে। গাছ-পাথর-নদী-পাহাড়-আকাশ-বাতাস সবকিছু তার কাছে ছিল দেবতা। সবাইকেই সে দিত পূজার অর্ঘ্য। দেওয়া হত পশুবলি, নরবলি— দেবতা যাতে তুষ্ট থাকেন। সেই তুষ্টির উপর ভরসা করেই বয়ে চলত আদিম জীবন।

তারপর এল মধ্য যুগ। ঠেকতে ঠেকতে মানুষ তখন শিখেছে অনেক কিছু। অভিজ্ঞতা

বেড়েছে, জ্ঞান বেড়েছে। তবু রয়ে গেছে অনেক কিছু যার ব্যাখ্যা নেই। আদিম জীবনের সব বিশ্বাস তখনও ঝেড়ে ফেলা যায়নি। এ অবস্থাতেই ঘটল ধর্মের আবির্ভাব। আগে ছিল ওঝা বা ডাইন, তাদের স্তরটা ছিল ব্যক্তিগত। এবার এল ধর্মীয় সংঘ। ধর্মগুরুরা ধর্মকে সমষ্টিগত রূপ দিলেন, ধর্ম পরিণত হল মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার যন্ত্রে। কিন্তু এ যুগের মত সে যুগেও ছিল সন্দেহবাদীর দল, যারা প্রশ্ন করতে চাইত। তাদের কণ্ঠরোধ করতে না পারলে ধর্মগুরুদের প্রভুত্ব টেকে না। তাই প্রচারিত হল ধর্মগ্রন্থগুলি স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত। কিন্তু থেমে কি গেল প্রশ্নের ঝড় ? প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বাড়ল, প্রকৃতির অলৌকিক ব্যাপারগুলি একটু একটু করে ঢুকতে লাগল লৌকিকতার ভাণ্ডারে। ফলে জানার স্পৃহা বাড়ল আরো, জাগল নতুন নতুন প্রশ্ন। ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার সঙ্গে সংঘাত লাগল নতুন পাওয়া জ্ঞানের। শুরু হয়ে গেল ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘর্ষ। তখন মানুষের জ্ঞান বেড়ে চলেছে অতি দ্রুত। ইউরোপে শুরু হয়েছে রেনেসাঁ। বিজ্ঞানমনস্কদের ধারণা হল যা কিছুরই অস্তিত্ব আছে, তাই জানা যাবে, তাই মাপা যাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে। এই পজিটিভিজ্‌ম তত্ত্বকে আশ্রয় করে বিজ্ঞান সবকিছুরই জবাব খুঁজতে চাইল। একদিকে বস্তুজগৎ, অন্যদিকে মন- আত্মা- চৈতন্য ; একদিকে আধিভৌতিক— আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে, অন্যদিকে আধিদৈবিক— সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। কীভাবে হয়েছে সমন্বয় ? এর সমাধান খুঁজতে ব্যস্ত হলেন তখনকার চিন্তাবিদ্‌রা।

এলেন রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০), তাঁর দ্বৈতবাদ নিয়ে। বললেন, আধিদৈবিকও সত্য, আধিভৌতিকও সত্য, কিন্তু দুটো চলে সমান্তরালভাবে, একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও সম্পর্ক নেই, তাই সমন্বয়েরও কোনও প্রশ্ন নেই। পরবর্তী চিন্তাবিদদের কেউ গেলেন আধিদৈবিকের দিকে, সৃষ্টি করলেন নানা রকমের ভাববাদ। অন্যরা গেলেন আধিভৌতিকের দিকে, তৈরি হল বস্তুবাদ। কার্তেসীয় দর্শন অনুযায়ী আত্মা শুধু মানুষেরই আছে। পশুপাখি, গাছগাছালি আত্মাশূন্য। সবই বস্তু, মানুষের দেহটাও। পুরো ব্রহ্মাণ্ডটাই একটা মেশিন। সব কিছুই তো জড়। কাজেই যথেচ্ছভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়। শুরু হল বিজ্ঞানের পরিবেশবিরোধী জয়যাত্রা।

বস্তুবাদেও দেখা দিল ব্যষ্টিবাদ ও সমষ্টিবাদ। ইউরোপীয় চার্বাকরা মনে করলেন, দেহটা যেহেতু যন্ত্র, সেটাকে অমিতভোগের কাজে লাগানো যাক। কিন্তু রসদের পরিমাপ যে অসীম নয়। কাজেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ ঢোকানো হল সমাজতত্ত্বে। বলা হল, শুধু শ্রেষ্ঠেরই আছে টিকে থাকার অধিকার, দুর্বলেরা চুলোয় যাক। সরকার যেন মাথা না গলায় এই বাঁচার লড়াই ও প্রবলের সমৃদ্ধিতে। হিউম, বার্ক, রুশো, বেন্থাম, হার্বার্ট স্পেন্সার ও অন্যরা ছিলেন laissez-faire নামে এই পুঁজিবাদী দর্শনের প্রবক্তা।

এই ব্যষ্টিবাদের বিপরীতে গড়ে উঠল মার্কসীয় সমষ্টিবাদ, যা ব্যক্তিকে করতে চাইল সমষ্টি বা রাষ্ট্রের অধীন। 'বাঁচার লড়াই' না হতে দিয়ে এই দর্শন সুযোগ-সুবিধার সমবণ্টনের দায়িত্ব দিতে চাইল রাষ্ট্রের হাতে। বস্তুবাদী বিজ্ঞান সারা ব্রহ্মাণ্ডের সব রহস্য ভেদ করতে চাইল, চাইল নানা রকমের কৌশল শিখে প্রকৃতিকে কবজা করতে। কিন্তু মাথার ওপরে যদি ভগবান থাকেন, কীভাবে সম্রাট হবে মানুষ ? এই উপলব্ধিই বিজ্ঞানের নাস্তিকতার মূলে।

ঠিক একই ব্যাপার দেখা গিয়েছিল প্রাচীন ভারতের কর্ম-মীমাংসা দর্শনে। বৈদিক সাহিত্যের কর্মকাণ্ড অংশে বিবৃত যাগযজ্ঞগুলিকেই এই দর্শন ক্ষমতার চাবিকাঠি মনে করত। নিখুঁত পদ্ধতিতে যজ্ঞ করতে পারলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কিন্তু মাথার উপরে পরমেশ্বর থাকলে কীভাবে তা সম্ভব ? তাই কর্ম-মীমাংসকরা ভগবানকে পাত্তা দেননি।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগে, ধর্মীয় শোষণের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে ভগবানের ধারণাটা কেন দরকার হয়েছিল মানুষের ? দুটো কারণ, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। বিপদের সময় কারোর সাহায্য চেয়ে মনের জোর বাড়ানোর জন্য কিংবা দুঃখজর্জর দিনগুলিতে কারোর কাছে শোকের বোঝা হালকা করে দিয়ে সান্ত্বনা পাবার জন্য ব্যক্তি-মানুষের দরকার হয় ভগবানের ধারণার। আবার সমষ্টিগত পর্যায়ে মানুষের বন্য স্বভাব ও রিপুগুলিকে বশে না রাখতে পারলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। আইন দিয়ে সবটা সম্ভব নয়, কারণ আইনকে লোকে ফাঁকি দিতে চায় এবং কেউ কেউ পারেও। তাই এমন একটা পদ্ধতির দরকার হয়েছিল সমাজপতিদের, যা লোকে ফাঁকি দিতে চাইবে না। তাই দরকার হয়েছিল ভগবানের, যিনি দোষ করলে শাস্তি দেবেন, ভাল কাজ করলে পুরস্কার দেবেন, ইহলোকে বা পরলোকে। এই পাপ-পুণ্য তত্ত্বই শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল মরালিটিতে। বিপদ বা দুঃখের সময় যাঁর সেগুলো বণ্টনের জন্যে ভগবানের দরকার পড়ে না, তিনিই নাস্তিক। নাস্তিকতা বা আস্তিকতা দুটোই বিশ্বাস মাত্র। এর সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কিত মূল প্রশ্নটার সম্পর্ক নেই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান বেড়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন পৃথিবীর মোট জ্ঞানভাণ্ডার এখনকার তুলনায় ছোট ছিল। সে যুগের জ্ঞান অনুযায়ী তখনকার চিন্তাবিদরা ভগবানের কিছ ধারণা স্থির করেছিলেন। সেগুলি আজ আমাদের কাছে ছেলেমানুষি মনে হতে পারে। কিন্তু তাতে ভগবানের প্রমাণ বা অপ্রমাণ হয় না। যেটা বিবেচ্য তা হল, আজকের পরিস্থিতিতে বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডার অনুযায়ী ভগবানের ধারণা প্রাসঙ্গিক কিনা। আর প্রাসঙ্গিক হলে এখনকার জ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সে ধারণা কীরকম হবে ?

দর্শনে দুটো প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব টানতে হয়েছিল। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকের সমন্বয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ব্যাখ্যা। এই দুই প্রসঙ্গের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখা যাক।

দেকার্তে মন ও বস্তুর সমন্বয় করতে পারেননি। তাই তিনি বলেছিলেন, এ দুটো আলাদা, পরস্পর-নিরপেক্ষ। একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও সম্পর্ক নেই। কী বলে আজকের বিজ্ঞান ? প্রথমে জীববিজ্ঞানের বক্তব্য দেখা যাক। ১৯৮১-র নোবেলজয়ী মার্কিন মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞ রজার স্পেরি বলেন,—

Current concepts of the mind-brain relations involve a direct break with the long-established materialist and behaviorist doctrine that has dominated neuroscience for many decades. Instead of renouncing on ignoring consciousness, the new interpretation gives full recognition to the primacy of inner conscious awarenss as a causal reality. (Changing Priorities, Neuroscience, Annual Review, 1981)

বিজ্ঞানের বস্তুবাদী তত্ত্ব মগজের নিউরনগুলির মিথস্ক্রিয়াকেই মন বলতে চায়। কিন্তু স্পেরি এখানে মনের আলাদা অস্তিত্ব ধরতে চাইছেন, যা বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে।

অপর একজন নোবেলজয়ী, ব্রিটিশ স্নায়ু-শারীরবিদ স্যার জন ক্যারিউ এক্‌ল্‌স্‌ও এক দ্বৈতবাদী তত্ত্বের সমর্থক, যাতে primacy is given to the self conscious mind. । তাঁর মতে,

We have to assume that our self-

ওয়াকার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বহু ভূতাত্মার সমষ্টি হিসাবে ধরছেন। তবে তাঁর মতে এরা আলাদা আলাদা, সব মিলিয়ে অখণ্ড নয়। হিন্দু দর্শনে এই সমষ্টিকে অখণ্ড মনে করা হয়। বিজ্ঞানও ক্রমশ এই অখণ্ডতার ধারণায় গিয়ে পৌঁছাল। ডেভিড বোহ্‌মের ভাষায়,—

Parts are seem to be in immediate connection, in which their dynamical relationships depend, in an irreducible way, on the state of the whole system (and, indeed, on that of broader systems in which they are contained, extending ultimately and in principle to the entire universe). Thus one is led to a new notion of unbroken wholeness which denies the classical idea of analyzability of the world into separately and independently existing parts...We must turn physics around. Instead of starting with parts and showing how they work together (the Cartesian order), we start with the whole.

(Quoted by Gary Zukav in 'The Dancing Wu Li Masters', 1980)

এখানে বোহম বিজ্ঞানের প্রচলিত খণ্ডীকরণ প্রথার (reductionism) বিরুদ্ধে মুখর।

এভাবে বিজ্ঞানে বস্তুর অতিরিক্ত চৈতন্যের ধারণা এল। প্রথমে কেউ কেউ দ্বৈতবাদী হলেন এবং দুটোকেই সত্যি বলে ধরলেন, বোরের পরিপূরকতা নীতি অনুযায়ী,—

To us...the only acceptable point of view appears to be the one that recognizes both sides of reality—the quantitative and the qualitative, the physical and the psychical—as compatible with each other, and can embrace them simultaneously... It would be most satisfactory of all if *Physics* and *Psyche* (i.e. matter and mind) could be seen as complementary aspects of the same reality.

(Wolfgang Pauli, Interpretation of Nature and the Psyche, 1955)

এভাবে দুটোকেই সত্যি এবং পরস্পরের পরিপূরক ধরলে সমন্বয়ের কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু সমন্বয়টা যুক্তির সাহায্যে দেখানো যায় না (উচ্যতে, ন তু লক্ষ্যতে)। তখন মানতে হয় যে সমন্বয়টা হয়েছে মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তির উপরের স্তরে, শ্রীচৈতন্য যেমনটা করেছিলেন তাঁর অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে। ব্যাপারটাকে 'অচিন্ত্য' মেনে নিলে তা ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, সমষ্টিগত জ্ঞানের পর্যায়ে সেটাকে টানা যায় না। ফলে আলোচনাও চালানো যায় না। এই কারণে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব বিজ্ঞানের উপযুক্ত নয়। এজন্যেই শঙ্করাচার্য তাঁর কেবলাদ্বৈতবাদে একটাকে সত্যি ধরে অন্যটাকে নাকচ করেছিলেন। পাউলি দ্বৈতবাদের দিকে ঝুঁকলেও অন্য অনেক বিজ্ঞানী তাই অদ্বৈতবাদের দিকে গেলেন,—

The stuff of the world is mind-stuff...The mind-stuff is not spread in space and time...Recognizing that the physical world is entirely abstract and without "actuality" apart from its linkage to consciousness, we restore consciousness to the fundamental position instead of representing it as an inessential complication occasionally found in the midst of inorganic nature at a late stage of evolutionary history.

(Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, 1928)

ঢেউ গতিবিদ্যার জনক এরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চৈতন্যকে বহু খণ্ডে বিভক্ত না ধরে এক ও অখণ্ড ধরতে চাইলেন,—

Mind has erected the objective outside world of the natural philosopher out of its own stuff. Mind could not cope with this gigantic task otherwise than by the simplifying device of excluding itself...withdrawing from its conceptual creation.

আরও—

There is obviously only one alternative, namely the unification of minds or consciousness. Their multiplicity is only apparent, in truth there is only one mind. This is the doctrine of the Upanishadas.

('What is Life' and 'Mind and Matter', 1958)

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে দেখানো গেল, আধুনিক পদার্থবিদ্যার রূপকাররা পদার্থবিদ্যার জটিল তত্ত্ব ও জটিলতর অঙ্ক নিয়ে ঘাটতে ঘাটতে বস্তুজগৎ ছাড়িয়ে শেষপর্যন্ত অখণ্ড পরমচৈতন্যে গিয়ে পৌঁছেছেন। কীভাবে এমনটা সম্ভব হল ? কিছু ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক।

আগে ধারণা ছিল বস্তু ও শক্তি আলাদা। সেজন্য দুটোর জন্য পৃথক পৃথক নিত্যতা সূত্র ছিল। আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে (১৯০৫) দেখালেন যে ভর ও শক্তি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য,—

$$E^2 = m^2c^4 + p^2c^2$$

ভরবেগ (p) শূন্য হলে $E = \pm mc^2$। এই ঋণাত্মক অংশটা থেকেই ডিরাক প্রতিবস্তুর ধারণা পেয়েছিলেন। এরপর কণা ও তরঙ্গের অভিন্নতা দেখালেন লুই দ্য ব্রয় (১৯২৫),—

$$p\lambda = h$$

অর্থাৎ ভরবেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গুণফল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের সমান। কাজেই বস্তুরও তরঙ্গধর্ম আছে। প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক প্রকাশিত হয় আর্গ-সেকেণ্ড এককে। অর্থাৎ শক্তি × সময়। এমন রাশিকে বলা হয় ক্রিয়া। শক্তি একটা ত্রিমাত্রিক রাশি, কিন্তু ক্রিয়া হল চতুর্মাত্রিক। ভর বা শক্তি আপেক্ষিক, কিন্তু ক্রিয়া হল অনপেক্ষ। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে একমাত্র ক্রিয়াই জেগে থাকে পরম নিত্য হয়ে। তাই কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ভর বা শক্তির বদলে প্রচলিত হল ক্রিয়ার সংরক্ষণ সূত্র। ইতিমধ্যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে (১৯১৫) আইনস্টাইন দেখালেন যে মহাবিশ্বের মোট স্থান সসীম এবং চতুর্মাত্রিক স্পেস-টাইমের যেখানেই বস্তু থাকে, সেখানেই মহাকর্ষের দরুন ভাঁজ পড়ে। আরও টেনে নিয়ে গেলে এ তত্ত্বের বক্তব্য দাঁড়ায় সমস্ত ভরই হল স্পেস-টাইমের ভাঁজ, শক্তিও তাই, যেহেতু তারও ভর আছে। মহাকর্ষ নেহাতই একটা কল্পিত জিনিস। পুরো ব্রহ্মাণ্ডটাই স্পেস-টাইমের গতিশীল ভাঁজ, এর বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছু নেই। তবু আমরা এই রূপহীন জিনিসটাকে নানারূপে দেখি।

শ্রোয়েডিঙ্গারের ভাষায়,

There is only one thing and...what seems to be a plurality is merely a series of different aspects of this one thing, produced by a deception

(The Indian Maya).

এইভাবে আধুনিক পদার্থবিদ্যা বস্তু ও শক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদন করে শেষে পুরোটাকেই অস্তিত্বহীন করে দিল।

১৯২৬ সালে ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ দিলেন তাঁর অনিশ্চয়তা সূত্র। এই সূত্র অনুযায়ী একটা কণার অবস্থান ও ভরবেগ দুটোই একই সঙ্গে নিখুঁতভাবে মাপা যায় না। একটা যত নিখুঁত হয়, অন্যটা তত অনিশ্চিত হয়ে যায়। যে কোনও একজোড়া চলরাশি যাদের গুণফল চতুর্মাত্রিক অর্থাৎ ক্রিয়া, তাদের ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রযোজ্য। এই নিয়ম শুধু কণাজগতের নিয়ম নয়, সাধারণভাবে এটা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বেলায় খাটে। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে কোন কিছু জানা

সম্ভব নয়। প্রকৃতির আচরণে কার্যকারণ সূত্র আবশ্যিক নয়, যদৃচ্ছভাবেও ঘটনা ঘটতে পারে। হাইসেনবার্গ বললেন, তাত্ত্বিকভাবে দেখলে অতীতকে আমরা নিখুঁতভাবে জানতে পারি, কিন্তু বর্তমানকে নয়। তাঁর মতে,

In the experiments about atomic events we have to do with things and facts, with phenomena that are just as real as any phenomena in daily life. But the atoms or elementary particles themselves are not as real; they form a world of potentialities on possibilities rather than one of things on facts.

(Physics and Philosophy, 1959)

সাংখ্য দর্শনের অব্যক্ত-ব্যক্ত তত্ত্বের মতো হাইসেনবার্গ একটা দ্বৈত বিশ্বের (Duplex world) ধারণা দিলেন। একটা বহু সম্ভাবনার সমষ্টি, অন্যটা, একটিমাত্র বাস্তব যা ছিল, সেই সম্ভাবনায় লীন। এটাকে না মেনে হিউ এভারেট দিলেন বহু বিশ্বের ধারণা। অর্থাৎ সবকটা সম্ভাবনাই বাস্তবায়িত হয় কিন্তু থাকে আলাদা আলাদা চতুর্মাত্রায়। বিজ্ঞানীর অবস্থান একটিমাত্র চতুর্মাত্রায়, তাই তিনি যখন দেখতে যান, তখন একটা বাস্তব পান, অন্যগুলো পান না।

এই অবাস্তব, অনির্ণেয় বিশ্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যও পৌঁছেছিলেন একই সিদ্ধান্তে। গীতার শাঙ্করভাষ্যে তিনি বলেন,—

Its form, as described here, cannot be determined with any degree of certainty. It is apparent like a dream, water of a mirage or a city in the sky. It is fugitive, its own form being evinced and not evinced. Therefore it has no end, no fixity, no determinacy, it never stays as a particular form exclusive of other forms; it can never be determined conclusively. Similarly, it has no beginning; nobody can determine it as starting from something and becoming something definite. Nobody can determine it as having any definite existence or intermediate existence.

(নৃসিংহচরণ পাণ্ডা রচিত 'মায়া ইন ফিজিক্স'-এ উদ্ধৃত)।

নির্ণয়বাদ এভাবে ধসে যাওয়ায় আইনস্টাইন ও শ্রোয়েডিঙ্গার খুশি হলেন না। কণাগুলি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে কণার মতো এবং অন্যথায় তরঙ্গের মতো ব্যবহার করে অথবা অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। ফলে একটা অনির্ণেয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। শ্রোয়েডিঙ্গার এই ব্যাপারটাকে ব্যঙ্গ করে বানালেন একটা ধাঁধা, নাম 'ক্যাট প্যারাডক্স'। একটা ইলেকট্রন যাওয়ার যদি দুটো পথ থাকে আর একটা পথের সঙ্গে বিষ-নিঃসরণের ব্যবস্থা থাকে যাতে একটা বাক্সবন্দী বিড়ালের মৃত্যু হয়, তবে দর্শকের অনুপস্থিতিতে ইলেকট্রনটা তরঙ্গের মত আচরণ করে দুটো পথ দিয়েই যাবে। ফলে বিড়ালটা বাঁচা, মরা বা মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে না, বরং একই সঙ্গে বাঁচা ও মরা উভয় অবস্থায় থাকবে। ফলে প্রকৃত অবস্থা অনির্ণেয়। এই বিড়াল-ধাঁধা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ব্যঙ্গচিত্র। কিন্তু ব্যঙ্গ হলেও এটা সত্যি। বিখ্যাত দ্বিছিদ্র পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এটা প্রমাণ করলেন। কণাগুলি বিজ্ঞানীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে আলাদা আচরণ করে। তাদের ঠকাতে যতই সূক্ষ্ম যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকুক না কেন, কণাগুলি ঠিক বুঝে নেয় বিজ্ঞানীর অভিসন্ধি।

আইনস্টাইন চটেমটে বললেন, ভগবান এভাবে পাশা খেলতে পারেন না। বরিস পোডোলস্কি ও নাথান রোজেন নামে অন্য দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে মিলে তিনি বানালেন আরেকটা ধাঁধা, নাম 'ই- পি- আর প্যারাডক্স'। মনে করা যাক ক ও খ দুটো কণা, যারা কাছাকাছি আছে এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে। তাদের দূরত্ব এবং মোট ভরবেগ নির্ণয় করা হল। এরপর ক রইল পৃথিবীতে আর খ চলে গেল বহু আলোকবর্ষ দূরে। এর মধ্যে আর কোনও শক্তি তাদের প্রভাবিত করল না। এইবার বিজ্ঞানী ক-এর ভরবেগ নির্ণয় করলেন নিখুঁতভাবে। মোট থেকে বাদ দিয়ে খ-এর ভরবেগ পাওয়া গেল। এবার ক-এর অবস্থান নির্ণীত হল। ফলে ক-এর ভরবেগ পালটে গেল হাইসেনবার্গের তত্ত্ব অনুযায়ী। খ-এর ভরবেগ ধরা যাক পাল্টাবে না, কারণ তা বহু আলোকবর্ষ দূরে। এইবারে ক-এর অবস্থান, খ-এর ভরবেগ এবং বিচ্ছেদের আগে দূরত্ব— এ দিয়ে অঙ্ক কষে খ-এর অবস্থান নির্ণীত হল। কাজেই খ-এর অবস্থান ও ভরবেগ দুটোই নিখুঁতভাবে মাপা গেল। হাইসেনবার্গের তত্ত্ব অতএব ভুল। অন্যথায় ক-এর ভরবেগ পালটালে তৎক্ষণাৎ, শূন্য সময়ে, বহু আলোকবর্ষ দূরে খ-এর ভরবেগ পালটায়। কীভাবে তা সম্ভব, প্রশ্ন করলেন আইনস্টাইন।

এই ধাঁধা বিজ্ঞানীদের তন্দ্রা ছুটিয়ে দিল। কীভাবে এটা পরীক্ষা করা যায়? ডেভিড বোহ্‌ম প্রস্তাব দিলেন স্পিন মাপা যাক। পরমাণুর একটা কক্ষপথে থাকে দুটো ইলেকট্রন, যাদের স্পিন বা কৌণিক ভরবেগ পরস্পরের উল্টো। একটা ডাইনে ঘুরলে

সাংখ্য দর্শনের ব্যক্ত-অব্যক্ত তত্ত্বের মতো হাইসেনবার্গ একটা দ্বৈত বিশ্বের ধারণা দিলেন। একটা বহু সম্ভাবনার সমষ্টি, অন্যটা, একটিমাত্র বাস্তব যা ছিল, সেই সম্ভাবনায় লীন। এটাকে না মেনে হিউ এভারেট দিলেন বহু বিশ্বের ধারণা। অর্থাৎ সবকটা সম্ভাবনাই বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু থাকে আলাদা আলাদা চর্তুমাত্রায়। বিজ্ঞানীর অবস্থান একটিমাত্র চতুর্মাত্রায়।

অন্যটা ঘোরে বাঁয়ে। জোর করে একটার স্পিন পাল্টে দিলে অন্যটারও পাল্টে যায়। স্পিনের তিনটে রাশি— ভর, আকার, ঘূর্ণনের হার। ফলে তিনটে জুড়ি হয়। প্রত্যেকটা জুড়ির ওপর হাইসেনবার্গের তত্ত্ব প্রযোজ্য। এ থেকে জন বেল একটা গাণিতিক সূত্র বানালেন, তার নাম বেলের অসাম্য। সেটা যদি বজায় না থাকে, তবে অনিশ্চয়তা সূত্র ঠিক এবং আইনস্টাইন ভুল। যদি দর্শক-নিরপেক্ষভাবে বাস্তবের অস্তিত্ব থাকে, সব কিছুরই কারণ থাকে এবং আলোর গতিবেগই চরম হয়, তবে এই অসাম্য বজায় থাকবে। বেল নিজে প্রোটন নিয়ে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, এই অসাম্য বজায় থাকে না। অন্যরাও বিভিন্ন কণা নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। শেষপর্যন্ত ১৯৮২ সালে অ্যালান আস্পেক্ট ও তাঁর সঙ্গীরা ফোটন পরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে দেখালেন, অনিশ্চয়তা সূত্র সত্য।

এভাবে প্রমাণিত হল, দুটো কণা একদা কাছাকাছি থেকে মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে পরে দূরে চলে গেলেও পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির সময় সব কণাই কাছাকাছি ছিল। পরে দূরে চলে গেছে। অতএব এখনও তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। একেই বলে ম্যাকের নীতি (Mach Principle)। অর্থাৎ যে কোনও একটি ঘটনা বাকি ব্রহ্মাণ্ডকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করে।

কীভাবে ব্রহ্মাণ্ডের একটা খণ্ডাংশ বাকি সমস্তটাকে প্রভাবিত করে? এ কারণেই ডেভিড বোহ্ম খণ্ডের বদলে অখণ্ডকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আপাত বিশ্বের খণ্ডাবস্থার নিচে অধিষ্ঠান (substratum) হিসাবে আছে একটা অখণ্ড সত্তা। এই অখণ্ড সত্তাকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় বলে ফিল্ড। মনে করা হত, ফিল্ডটা আসলে শূন্য, বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যের মত। কিন্তু দেখা গেল, এই শূন্য থেকে 'ভারচুয়াল' কণার দল আচমকা লাফিয়ে উঠে নেচে বেড়ায়, আবার যায় ডুবে। কণা হয়েও যা কণা নয়, তাই হচ্ছে ভারচুয়াল কণা, অস্তি ও নাস্তির মাঝে তা ডিগবাজি খায়। মৌলিক বলগুলির পরিবাহী গ্লুওনগুলি হচ্ছে ভারচুয়াল কণা। যথেষ্ট শক্তি জোগালে এরা প্রকৃত কণা হতে পারে। তাই এখন ভাবা হয়, শূন্য আসলে শূন্য নয়, আসলে এটা পূর্ণ। বাস্তব সবকিছুরই রূপান্তর ঘটে, কিন্তু নাস্তি কীভাবে অস্তি হয়? এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য গীতার সেই নিত্যতা সূত্র, নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ (২-১৬)। যা নেই তা আছে হয় না, যা আছে তা নেই হয় না। কাজেই যখন দেখা যাবে বাস্তব জিনিস শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, রূপান্তর ঘটছে, শূন্যটা আসলে পূর্ণ। কিন্তু কী সেই পূর্ণের চরিত্র? এক অংশে আন্দোলন ঘটলে কীভাবে তা সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হয় সর্বত্র? এ থেকেই বিজ্ঞানীরা করছেন এই পূর্ণের চৈতন্যময়তার ধারণা। হ্যিগনারের মতে,

The formal inclusion of consciousness in physics could well become an essential feature of any further advance in our scientific understanding.
(Symmetries and Reflections, 1967)

এতক্ষণ দেখানো গেল পদার্থবিজ্ঞানে অখণ্ড পরম-চৈতন্যের ধারণার উদ্ভব। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকের সমন্বয় করতে গিয়ে এভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান আধিভৌতিককে নাকচ করে তুরীয় অদ্বৈতবাদের দিকে ঝুঁকছে।

এই অবস্থায় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়ে থাকে, তার নাম মানুষমুখী নীতি (Anthropic Principle)। এতে দেখানো হয় যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির বিভিন্ন সময়ে বহু সম্ভাবনার মধ্যে একটা বিশেষ এবং নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটেছে। বারে বারে এভাবে বহু সম্ভাবনার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা বাস্তবায়িত হয়েছে, ফলে মানুষ পর্যন্ত এসেছে। যদি একবারও এর ব্যতিক্রম হত, তবে মানুষের উদ্ভব সম্ভব হত না। ১৯৬৭ সালের নোবেলজয়ী জীবপদার্থবিদ্ জর্জ ওয়াল্ড ব্যাপারটাকে এভাবে সাজিয়েছেন—

If there had not apparently existed a one-part-per-billion inequality in the numbers of particles and anti-particles that went into the Big Bang; *if* the atomic nuclei were not so much massier than the electrons weaving about them; *if* the electric charge on the proton did not exactly equal that on the electron; *if* ice did not float; *if* the forces of dispersion and aggregation in the universe were not in exact balance —then there might still be a universe, but lifeless.
("The cosmology of Life and Mind", Synthesis of Science and Religion, 1988)

অর্থাৎ প্রথম থেকেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল মানুষমুখী। ক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকে কর্তার মনে, কাজেই এই উদ্দেশ্যটা ভগবানেরই ছিল। এই নীতি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের teleological principle-এর একটা বৈজ্ঞানিক রূপ।

হিন্দু দর্শনের লীলাবাদের এটি সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু দর্শন অনুযায়ী কারণ তিন প্রকার— নিমিত্ত কারণ, যে কাজটা করে; সহকারী কারণ, যা দিয়ে করা হয় অর্থাৎ যন্ত্র; উপাদান কারণ, বস্তুর রূপান্তর ঘটলে প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তুর উপাদান কারণ। এখানে উদ্দেশ্যের কোন প্রশ্ন নেই। সৃষ্টিটা যেহেতু ভগবানের লীলা, কাজেই এতে উদ্দেশ্য নিহিত নেই। লটারিতে কোন্ টিকিটটা প্রথমে উঠবে তাতে টিকিট-উত্তোলকের যেমন উদ্দেশ্য থাকে না। ফলে হিন্দু দর্শন নির্ণয়বাদী নয়, যদৃচ্ছাবাদী (Randomistic)।

এই উদ্দেশ্যবাদ গজিয়েছে বাইবেলের জেনেসিস থেকে। ভগবান ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, সপ্তম দিন অর্থাৎ রবিবারে বিশ্রাম নিলেন। এই কারণে রবিবার ছুটির দিন। এই সাবাথের ধারণায় যে ভাবটা নিহিত, তা হল মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষে এসে বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে ভগবান বিশ্রাম নিতে পারেন। মানুষে এসে সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়েছে এই ধারণা আত্মম্ভরী বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নয়। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মানুষে না এসে অন্যদিকে গেলেও ব্যাপক অর্থে কিছু এসে যেত না। ফলে সৃষ্টির লক্ষ্য মানুষমুখী হতে পারে না। এই কারণে অ্যানথ্রোপিক নীতি বৈজ্ঞানিক নয়। সৃষ্টির কারণ-ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা নয়। খ্রিস্টীয় দর্শনে কারণ আর উদ্দেশ্যকে একত্রে মিশিয়ে ফেলাতেই এই বিপত্তি, যার দ্বারা বৈজ্ঞানিকরাও প্রভাবিত হয়েছেন।

এবারে যাওয়া যাক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ব্যাখ্যায়। প্রথমে প্রশ্ন জাগে, সৃষ্টি আদৌ হয়েছিল কিনা। ধর্মগ্রন্থগুলি বলে, সৃষ্টিটা হয়েছিল এবং ভগবান সেটা করেছিলেন। এ কারণে একটা সময়ে তথাকথিত নাস্তিকদের (অর্থাৎ অস্তির বদলে যারা নাস্তিতে বিশ্বাস করে, যুক্তিপ্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল মানতে ভারি আপত্তি ছিল। বস্তুবাদীরা বলতেন, বস্তুর রূপান্তর ঘটে, ধ্বংস নয়। বস্তু অনাদি এবং অনন্ত। অতএব ব্রহ্মাণ্ডর সৃষ্টি বা ধ্বংসের প্রশ্ন নেই।

এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান দিতে প্রথম এগিয়ে এল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র। এই সূত্র অনুযায়ী কাজ করলে শক্তিক্ষয় হয়। শক্তি ধ্বংস হয় না, কিছুটা শক্তি অপ্রাপ্য হয়ে যায়। একে বলে এনট্রপি। যত কাজ হয়, এনট্রপি তত বাড়ে। এই অপ্রাপ্য শক্তি সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাপের ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। কোনও বদ্ধ সিস্টেম, যার বাইরে থেকে শক্তি আহরণের সুযোগ নেই, তার ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রযোজ্য। সূত্রটা সংখ্যাতাত্ত্বিক, ফলে সেই সিস্টেমে বহু বস্তুর উপস্থিতি দরকার। এনট্রপির উল্টো হল নেগেনট্রপি বা ঋণশক্তিক্ষয় অর্থাৎ শক্তিসঞ্চয়। খোলা সিস্টেমের বেলায় এটা প্রযোজ্য। যেমন পৃথিবী একটা খোলা

সিস্টেম, তা সূর্য থেকে শক্তি পায়। তা দিয়ে উদ্ভিদসম্প্রদায় সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে শক্তিসঞ্চয় করে, যা নেগেনট্রপির উদাহরণ। সূর্যকেও এই সিস্টেমের অর্ন্তভুক্ত করলে তখন হয় বদ্ধ সিস্টেম। তখন দেখা যায়, সূর্যের অধিকাংশ শক্তিই গাছগাছালির খপ্পরে না পড়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ পুরো সিস্টেমটায় একুনে এনট্রপি বৃদ্ধি ঘটে। যদি ব্রহ্মাণ্ড বদ্ধ সিস্টেম হয়, তবে এমন একটা সময় আসবে যখন পুরো শক্তিটাই অপ্রাপ্য হয়ে যাবে। ফলে সম্পূর্ণভাবে তাপীয় ভারসাম্য সৃষ্টি হবে এবং আর কাজ হতে পারবে না। তখন ব্রহ্মাণ্ডের তাপমৃত্যু ঘটবে, কারণ রূপধারণ করার জন্যও শক্তি দরকার। সেক্ষেত্রে একদিন প্রাপ্যশক্তির পরিমাণ সর্বাধিক ছিল, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ড সসীম হলে তার জন্ম-মৃত্যু আছে। মাইকেলের ভাষায়, জন্মিলে মরিতে হবে কিংবা শঙ্করের ভাষায়, যদারব্ধং তদনিত্যম্। তাপগতি-বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র এটাই দাবি করে।

এই সূত্র মার্কসীয় ও অন্যান্য বস্তুবাদীদের প্রচুর গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড অসীম, বস্তু ও গতি সদানিত্য। ফলে ব্রহ্মাণ্ড একটা খোলা সিস্টেম। ফলে এনট্রপি ও নেগেনট্রপি পরস্পরকে নাকচ করে। এভাবে এঙ্গেল্‌সের সময় থেকে মার্কসীয় দর্শন এই সূত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে আসছে। একালেও তা অব্যাহত,—

Marxist-Leninist theory defines matter as an objective reality that exists independently of our consciousness while being reflected in it. This definition is clarified and supplemented by natural-science data about the structure and characteristics of matter. Congnition of these aspects means cognition of matter itself. Matter, which is inseparably linked with motion, space and time, is capable of self-developement and is quantitatively and qualitatively infinite.
(G. N. Alekseev, Energy and Entropy)

এইসব দার্শনিক তর্কের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরা স্থির করলেন, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বস্তু যে নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব নয়, সেটা দেখাল কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা। স্থানকাল যে সসীম, তা দেখাল আপেক্ষিকতাবাদ। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কোনও প্রমাণ আছে কি? এবার সে খোঁজে এগোল জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা।

১৯২৯ সালে এডউইন পাওয়েল হাব্‌ল আবিষ্কার করলেন ব্রহ্মাণ্ড প্রসারণশীল। এই প্রসারণ মহাকর্ষের বিরোধী, সুতরাং এটা এল কোথা থেকে? এর আগেই লেমাত্রে ও এডিংটন একটা মহাজাগতিক ডিমের কথা ভেবেছিলেন। ডিমটা ফেটে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্ব হাব্‌লের আবিষ্কারের ব্যাখ্যা দিতে পারল। বিস্ফোরণের ফলে প্রসারণ শক্তির সৃষ্টি হয়, যার দরুন ভিতরের পদার্থগুলি ছড়িয়ে পড়ে। জর্জ গ্যামো এই মহাবিস্ফোটের নাম দিলেন বিগ ব্যাং। নামটার মধ্যে অবশ্য শব্দের দ্যোতনা আছে, কারণ পৃথিবীতে বিস্ফোরণ হলে আমরা শব্দ শুনি।

ধর্মগ্রন্থগুলি বলে, সৃষ্টিটা হয়েছিল এবং ভগবান সেটা করেছিলেন। এ কারণে একটা সময়ে তথাকথিত নাস্তিকদের (অর্থাৎ অস্তির বদলে যারা নাস্তিতে বিশ্বাস করে, যুক্তিপ্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল মানতে ভারি আপত্তি ছিল। বস্তুবাদীরা বলতেন, বস্তুর রূপান্তর ঘটে, ধ্বংস নয়। বস্তু অনাদি এবং অনন্ত। অতএব ব্রহ্মাণ্ডর সৃষ্টি বা ধ্বংসের প্রশ্ন নেই।

সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় অতি ভয়ঙ্কর তাপের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন বস্তুর উপস্থিতি সম্ভব ছিল না, ছিল শুধু বিকিরণ আর নৃত্যরত কণার দল। পরে ব্রহ্মাণ্ড আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রাথমিক বিকিরণ কি হারিয়ে গেছে? গ্যামো বললেন, না, তা আজও আছে। গোড়ার দিকে এর শক্তি বেশি থাকায় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছিল অত্যন্ত কম, যাকে বলে গামা বিকিরণ। এখন ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হয়েছে, ফলে সৃষ্টিকালীন বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে এখন তা রেডিও তরঙ্গে পৌঁছানোর কথা, যা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমান পরিমাণে পাওয়া যাবে। পাওয়া গেলে এটাই হবে সৃষ্টির প্রমাণ। ফলে বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন এই প্রমাণ খুঁজতে। ১৯৬৫ সালে আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন খুঁজে পেলেন ৭.৩৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের এই বেতার সঙ্কেত, যা মহাকাশের সব দিক থেকে সমানভাবে আসছে। প্রমাণিত হল ব্রহ্মাণ্ড সসীম এবং তার জন্মমৃত্যু আছে।

কিন্তু সৃষ্টির আগের অবস্থায় কী ছিল? অবশ্যই আজ আমরা সময় বলে যা জানি, তখন তা ছিল না। তাই 'সৃষ্টির আগে' কথাটার অর্থ হয় না। কিন্তু মানুষের ভাষাতে অন্য ব্যবস্থা না থাকাতেই 'আগে' শব্দটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। মূল প্রশ্নটা অন্যভাবে প্রকাশ করলে হয়, ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে দেখা যাক ধ্বংসটা কীভাবে হবে।

ব্রহ্মাণ্ড প্রসারণশীল। কিন্তু মহাকর্ষের দরুন এই প্রসারণের হার ক্রমশ কমছে। কী হারে কমছে তা নির্ণয় করেছেন অ্যালান স্যাণ্ডেজ ও অন্যরা। পৃথিবী থেকে কোনও বস্তু তখনই বেরিয়ে যেতে পারে, যদি তার বেগ মুক্তিবেগের বেশি হয়।

দেখা গেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণবেগ মুক্তিবেগের কম। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড খোলা নয়,

বদ্ধ সিস্টেম। কাজেই কমতে কমতে প্রসারণ একদিন থেমে যাবে। তারপর শুরু হবে মহাসঙ্কোচ (Big Crunch)। এই সঙ্কোচন কোথায় শেষ হবে? যখন এনট্রপি সর্বোচ্চ হবে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের রূপধারণ করার মতো শক্তিও তখন আর প্রাপ্য অবস্থায় থাকবে না। কাজেই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্তে পরিণত হবে। সঙ্কোচন শেষ হবে শূন্যতে। অঙ্কশাস্ত্র তাই বলে। এর মানে কিন্তু ব্ল্যাক হোল জাতীয় কোনও অবস্থা নয়। ব্ল্যাক হোল শূন্য নয়, তার আয়তন আছে। সূর্যের বর্তমান ব্যাসার্ধ যদি সাত লক্ষ কিলোমিটার থেকে তিন কিলোমিটার হয়ে যায়, তবেই তা ব্ল্যাক হোল হবে। এখানে মহাকর্ষ এত বেশি যে আলোকরশ্মিও টান কাটিয়ে বেরোতে পারে না। তাই ব্ল্যাক হোল অদৃশ্য। মহাসঙ্কোচের ফলে ব্রহ্মাণ্ড ব্ল্যাক হোল হবে না, সম্পূর্ণভাবেই শূন্য হবে। অঙ্ক যদিও শূন্যের কথা বলে, বিজ্ঞানীরা এটা মানতে প্রস্তুত নন। যতই হোক, তাঁরাও তো মানুষ। এত সাধের ব্রহ্মাণ্ড এভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, এটা তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন। তাই তাঁরা শূন্যের বদলে একটা নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন—সিংগুলারিটি। অর্থাৎ বহুবচন একবচন হবে। শূন্যের জায়গায় এক ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা নিজেদের মনকেই চোখ ঠারতে চান। তাঁদের বক্তব্য, একবচন থেকে ঘুরে ব্রহ্মাণ্ড আবার বহুবচনের দিকে এগোবে। একোহহং বহুষ্যামি। এইভাবেই বহু-এক-বহু, প্রসারণ-সঙ্কোচন-প্রসারণের চক্র চলতে থাকবে। এ চক্র অনাদি, অনন্ত। এই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের দোদুল্যমান বা স্পন্দমান মডেল। এই আজগুবি একবচনকে মানলে ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্তে যায় না। সেক্ষেত্রে অপ্রাপ্য শক্তি কীভাবে প্রাপ্যে রূপান্তরিত হয়, সর্বোচ্চ এনট্রপি কীভাবে সর্বোচ্চ নেগেনট্রপিতে রূপান্তরিত হয়, সে ব্যাপারে বিজ্ঞান নীরব। প্রাপ্য শক্তি আবার সর্বোচ্চ না হলে পরবর্তী বিগ ব্যাংটা হবে কী করে? কাজেই এই স্পন্দমান মডেল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে এড়িয়ে যায়। একদা বিজ্ঞানের শৈশবে পূতনা রাক্ষসীর মত ধর্ম তাকে খুন করতে চেয়েছিল। আজ বিজ্ঞান যুবক হয়েছে, ঠেলতে ঠেলতে ধর্মকে অন্তেবাসী করে দিয়েছে। কিন্তু সংঘর্ষ আজও থামেনি। ভগবানের ভূত আজও বিজ্ঞানীদের তাড়া করে বেড়ায়। তাই তাঁরা বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শূন্যের মুখোমুখি হতে ভয় পান। সেই কারণেই সিংগুলারিটি।

অপ্রাপ্য শক্তি কীভাবে প্রাপ্যে রূপান্তরিত হয়, সে ব্যাপারে বিজ্ঞান নীরব। প্রাপ্য শক্তি আবার সর্বোচ্চ না হলে পরবর্তী বিগ ব্যাংটা হবে কী করে? কাজেই এই স্পন্দমান মডেল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে এড়িয়ে যায়। একদা বিজ্ঞানের শৈশবে পুতনা রাক্ষসীর মতো ধর্ম তাকে খুন করতে চেয়েছিল। আজ বিজ্ঞান যুবক হয়েছে, ঠেলতে ঠেলতে ধর্মকে অন্তেবাসী করে দিয়েছে। কিন্তু সংঘর্ষ আজও থামেনি।

সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখিয়ে বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। এই প্রবন্ধ সামঞ্জস্য দেখানোর জন্যে রচিত নয়। বিজ্ঞানের যেখানে ঘাটতি, সেখানে প্রাচ্য দর্শন কোনও যুক্তিপূর্ণ উত্তর জোগাতে পারে কিনা, সেটা দেখার জন্যেই বর্তমান প্রবন্ধ। আপাতত বেদান্ত দর্শন থেকে উত্তরটা খোঁজার চেষ্টা করা যাক। এই দর্শনে বিশ্বতত্ত্বের মূল উৎস ঋগ্বেদের বিখ্যাত নাসদীয় সূক্ত (১০.১২৯), অতঃপর বিভিন্ন উপনিষদ্। খ্রিস্টপূর্ব যুগে রচিত বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র এই দর্শনের প্রথম গ্রন্থ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন চিন্তাবিদ এই দর্শনের আলাদা আলাদা শাখা সৃষ্টি করেছেন। যেমন ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি। তবে যে দুটো মতবাদ বর্তমানেও বহু-আলোচিত, তা হল শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ এবং শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যের মতবাদ অনুযায়ী পরমজ্ঞান ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার, সমষ্টিগত প্রয়াসের ক্ষেত্রে তা অচিন্ত্য। বেদান্তদর্শন অনুযায়ী পরমজ্ঞান প্রসারণশীল, যত জানার চেষ্টা করা যায়, ততই তা বেড়ে যায়। এই জন্য এর নাম 'ব্রহ্ম', যা বর্ধিত হয়। এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক রূপের নাম গোডেলের উপপাদ্য (Godel's Theorem)। অপরদিকে শঙ্করের মতবাদে পরমজ্ঞানকে মানুষের যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই কারণে এ প্রবন্ধে কেবলাদ্বৈতবাদ অনুসৃত হল।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে প্রাচীন ভারতীয়রা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে কতটা গভীরভাবে জানতেন, সে ব্যাপারে অনবহিত পাঠকদের সুবিধার জন্য কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া যাক। ব্রহ্মাণ্ডের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল বিশ্ব, জগৎ, সংসার। সংস্কৃতে এই শব্দগুলি পৃথিবীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। 'বিশ্ব' অর্থাৎ সব। সবকিছুই যার অন্তর্ভুক্ত, তাই বিশ্ব। কার্ল সাগানের ভাষায়, The Cosmos is all that is or ever was or ever will be (Cosmos,1981)। জগৎ = গম্+ক্বিপ্। অর্থাৎ যা চলমান। সম্পূর্ণ জগৎ এবং তার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই সবসময় গতিশীল। কোনকিছুই স্থির হয়ে নেই। সংসার = সম্+সৃ+ঘঞ্। অর্থাৎ জগতে সবকিছুই একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল। সংসার ও Cosmos একই ভাব

প্রকাশ করে। আরও কয়েকটি ধারণা নিম্নরূপ,—

১। মহাজাগতিক অণ্ড (Cosmic egg), তার ভিতরে উৎপন্ন অত্যধিক তাপ এবং অণ্ডের বিস্ফোরণ (তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, ৭.১০.১ ; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ, ১.১৪৫, ৩.৭২ ; কঠক সংহিতা, ১৩.১২ ; শতপথ ব্রাহ্মণ, ৬.১, ২.৩)।

২। মহাবিস্ফোটের পর বিশ্বের প্রসারণ (মুণ্ডক উপনিষদ্, ১.১.৮)।

৩। অণ্ডের ভিতরে যা ছিল তার নাম দেওয়া হয়েছে 'আপঃ'। বিস্ফোরণের পরে যা হল তার নাম 'প্রাণ' (বিজ্ঞানের ফিল্ড)। বিস্ফোরণের শক্তির দরুন প্রাণের মধ্যে প্রবল কম্পনের সৃষ্টি হল (ব্রহ্মসূত্র, ১.৩.৩৯ ; কঠোপনিষদ্, ২.৩.২)। এর ফলে অত্যধিক তাপের সৃষ্টি হল (ঋগ্বেদ, ১০.১২৯.৩ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১.২.৬ ; তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২.৬.১, ৩.১.১-৫.১ ; মহাভারত, ১২.১৭৫.১৬, ১২.২৪৮.১৩, ১২.২৫০.১৭, ১২.৩২৭.২৬, ১৩.১৩৮.১৮ ; হরিবংশ, ১.২৯)।

৪। সেই উত্তপ্ত অবস্থায় প্রাণ থেকে 'আকাশ' বা 'অদিতি' (space) সৃষ্টি হল (ক.উ., ২.১.৭ ; মু.উ., ২.১.৩ ; প্রশ্নোপনিষদ্, ৬.৪ ; তৈ.উ., ২.১.১)।

৫। এর পর আকাশ থেকে বস্তু ও শক্তিকণা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হল (বৃ.উ., ১.৩.১, ১.৪.৪ ; প্র.উ., ১.৪-৫)।

৬। আপঃ, প্রাণ ও আকাশ উপাদানের দিক দিয়ে আলাদা নয় (ছান্দোগ্য উ., ৪.১০.৪-৫)। অর্থাৎ সবই ফিল্ডের বিভিন্ন অবস্থা।

৭। সেই উত্তপ্ত অবস্থায় 'আকাশ' থেকে জোড়ায় জোড়ায় কণা উৎপন্ন হচ্ছিল, আবার সেগুলি আকাশে মিশে যাচ্ছিল। এই জোড়াগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'দক্ষ'। সেসময় আলোর কণাই বেশি ছিল (ঋ. বে., ১০.১২৯.৫ ; ব্র. সূ., ১.১.২৪, ১.৩.৪০ ; ম. ভা., ৩.৮৩.৪৭, ৩.১৫৫.২ ; কূর্ম-পুরাণ, ১.২৫.৬৯-৭০)। সেই কণা বা 'রেণু'গুলি অনবরত বিশৃঙ্খলভাবে নৃত্য করছিল, যার ফলে সংঘাত, ধ্বংস, রূপান্তর ঘটছিল (ঋ. বে., ১০.৭২.৬)।

৮। তারপর আকাশ থেকে বায়বীয় পদার্থ অর্থাৎ গ্যাস সৃষ্টি হল (ব্র.সূ., ২.৩.৮ ; প্র. উ., ৬.৪ ; তৈ. উ., ২.১.১)।

৯। গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘ থেকে তারার সৃষ্টি (ঋ. বে., ৫.৪৭.৩, ১০.১২১.৫ ; যজুর্বেদ, ১৩.৩০ ; তৈ. ব্রাহ্মণ, ১.৫.২.৫ ; শ. ব্রা., ৭.৫.১.৮, ১০.৬.৫.২ ; জৈ. ব্রা., ২.৪৫ ; ঐতরেয় ব্রা., ৪.২০)। গ্যাসের ঘনীভবনের ফলে তাপের সৃষ্টি হল, যার ফলে তারাগুলি জ্বলতে লাগল (প্র. উ., ৬.৪)।

১০। পৃথিবী জন্মেছে সূর্য থেকে। সৌরজগতের সব গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহগুলির উৎপত্তি মূলত সূর্য থেকেই (তৈ. সংহিতা, ৩.৪.৩, ৭.৩.১০ ; শ. ব্রা., ১.৪.১.২২ ; জৈ. ব্রা., ১.৮৭ ; বায়ুপুরাণ, ৫০.৯৯.৫৩)।

১১। সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, অন্যান্য গ্রহ এবং মহাকাশ সমস্তই গোলাকার (জৈ. ব্রা., ১.২৫৭, ২.৬২ ; শ. ব্রা. ৭.১.১.৩৭)।

১২। পৃথিবীর অভ্যন্তর উত্তপ্ত গলিত বস্তুতে পূর্ণ (য. বে., ১১.৫৭ ; শ. ব্রা., ১৪.৯.৪.২১ ; তৈ. স., ৫.৫.২)।

১৩। পৃথিবী ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ নিজেদের অক্ষের চারদিকে এবং সূর্যের চারদিকে ঘোরে (য. বে., ৩.৬ ; ঐ. ব্রা., ৩.৪.৬)।

ব্রহ্মাণ্ডের স্পন্দমান মডেলের পরিবর্তে বেদান্ত দর্শনে 'ঊর্ণনাভি' বা মাকড়সা মডেল নেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে এক 'পর'। পরের অর্ধেক পরার্ধ। প্রথম পরার্ধে প্রসারণ ঘটে, দ্বিতীয় পরার্ধে সঙ্কোচন। মাকড়সা যেমন জাল ছাড়ে এবং ইচ্ছে করলে পুরোটা গুটিয়ে নিতে পারে, ব্রহ্মাণ্ড তেমনি শূন্য থেকে প্রসারিত হতে শুরু করে এবং সঙ্কুচিত হয়ে শূন্যে পরিণত হয়। শূন্য বলতে এখানে অব্যক্ত অবস্থাকে বোঝাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের ব্যক্ত অবস্থা অনিত্য, তার জন্ম-মৃত্যু আছে। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থাটা কি অনিত্য হতে পারে? একটা অসীম ও চিরন্তন ভাণ্ডার না থাকলে চক্রটা বরাবর চলবে কী করে? তাই অব্যক্ত অবস্থাটাকে অসীম ভাবা হয়েছে। মূল অবস্থাটার নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্ম'। যা বাস্তব অর্থাৎ সত্যিই আছে ('তৎ সৎ'), তাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কোন বস্তু নয়, তা পরম-চৈতন্য। চৈতন্য ব্রহ্মের গুণ নয়, ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্য। এই কারণে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গে উল্লেখ না করে ব্রহ্মকে ক্লীবলিঙ্গে রাখা হয়। চিরন্তন হতে গেলে ব্রহ্ম অবস্থার শর্ত কী? এইগুলি স্থির করা হয়েছে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মেনে। এনট্রপি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের ধারণা ছিল। ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এই সূত্র প্রযোজ্য বলে এর ধর্ম নিম্নরূপ—

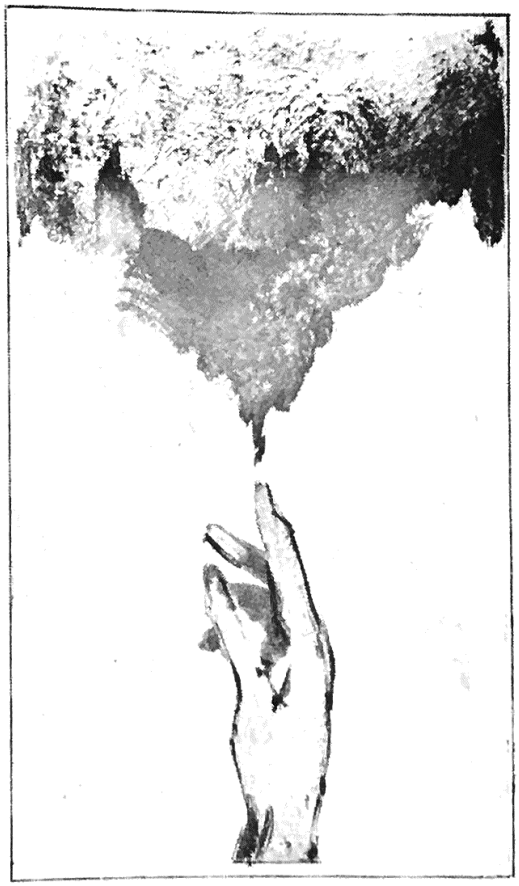

ব্রহ্মাণ্ডের স্পন্দমান মডেলের পরিবর্তে বেদান্ত দর্শনে 'ঊর্ণনাভি' বা মাকড়সা মডেল নেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে এক 'পর'। প্রথম পরার্ধে প্রসারণ ঘটে, দ্বিতীয় পরার্ধে সঙ্কোচন। মাকড়সা যেমন জাল ছাড়ে এবং ইচ্ছে করলে পুরোটা গুটিয়ে নিতে পারে, ব্রহ্মাণ্ড তেমনি শূন্য থেকে প্রসারিত হতে শুরু করে এবং সঙ্কুচিত হয়ে শূন্যে পরিণত হয়। শূন্য বলতে এখানে অব্যক্ত অবস্থাকে বোঝাচ্ছে।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্ । / সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং, বিপরীতমব্যক্তম্ ।।

(ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা—১০)

বেদান্ত দর্শনেরও একই ধারণা। বিপরীতক্রমে ব্রহ্মের ধর্ম কী ? নির্দিষ্ট অবস্থান, রূপ, গুণ ইত্যাদি রাখতে গেলে এনট্রপি হয়। কারণ এগুলি সবই ক্রিয়া। ফলে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, অসীম বা সর্বব্যাপী (নির্দিষ্ট অবস্থান নেই), নিরাকার, নির্গুণ। ব্রহ্ম যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে তার পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি সম্ভব নয়। ফলে ব্রহ্ম স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক নয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম ভগবান নয়। অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও সহকারী কারণকে বলা হয়েছে 'মায়া'। সৃষ্টির আগে মায়া অব্যক্ত ও অসীম অবস্থায় থাকে, কারণ তা ব্রহ্মের শক্তি। যখন ডিমটা গঠিত হতে শুরু করে, তখন মায়া খণ্ডিত হয়ে সসীম হয়ে যায়। এই অবস্থায় এবং বিস্ফোরণের আগে মায়াকে বলে মূল-প্রকৃতি। এর মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ে। তার নাম 'ঈশ্বর'। অদ্বৈত বেদান্তে ভগবানকে 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে। এই ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা। চৈতন্যের প্রতিবিম্বও চৈতন্যময়। অতএব ঈশ্বরের চেতনা আছে। ঈশ্বর সসীম এবং ক্রিয়াশীল, কাজেই ঈশ্বরের জন্মমৃত্যু আছে। ডিমের মধ্যে থাকাকালীন ঈশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট্‌পুরুষ। প্রতিবিম্ববাদ অনুযায়ী ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, কিন্তু উপাধিবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর ব্রহ্মের সসীম খণ্ডাংশ, ভাগটা হয়েছে মায়া দিয়ে। ঈশ্বরের তিনটি গুণ আছে—রজঃ, তমঃ, সত্ত্ব। প্রথমটা সৃষ্টি করে, দ্বিতীয়টা ধ্বংস করে এবং তৃতীয়টা সৃষ্টিরক্ষা করে। একেকটা গুণধারী অবস্থায় ঈশ্বরের তিন নাম—ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু। সৃষ্টির আগের অবস্থায় এই তিন গুণের মধ্যে ভারসাম্য থাকে। ভারসাম্যের অভাব দেখা দিলে ক্রিয়া শুরু হয় এবং ডিমটা গঠিত হয়। এনট্রপি যখন সর্বোচ্চ হয়, তখন আবার ভারসাম্য স্থাপিত হয়। ফলে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়। মায়া আবার অসীমের সঙ্গে মিশে যায় এবং প্রতিবিম্বটা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হয়। ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের আয়ুষ্কালকে বলা হয়েছে এক মহাকল্প। অসীম মায়া অনেক সসীম খণ্ডাংশে ভাগ হতে পারে। ফলে বহু ঈশ্বর এবং বহু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ঈশ্বরকে সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মকে পরমব্রহ্ম বলে। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডটা প্রতিবিম্বের দ্বারা মায়া থেকে তৈরি, তাই তা অবাস্তব। যা বাস্তব অর্থাৎ প্রকৃত সত্য, মায়ার আবরণ শক্তির দরুন তা আমরা বুঝতে পারি না এবং বিক্ষেপ শক্তির দরুন প্রকৃত সত্য অন্যান্য রূপে প্রতিভাত হয়।

বস্তুবাদী নাস্তিক ভগবানকে অস্বীকার করে নাস্তিকতায় যান। অদ্বৈত বেদান্ত একটি ভাববাদী দর্শন, যা ভগবানকে স্বীকার করেও নাস্তিক। যুক্তির পথ ধরে এই দর্শনের চিন্তাবিদরা বিশ্বতত্ত্বের কিছু ব্যাখ্যায় উপনীত হয়েছিলেন, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান আজও ধন্দে আছে। সেই কারণে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে অদ্বৈত বেদান্ত আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকে স্বীকার করেননি। তাঁর অজাতিবাদ অনুযায়ী, ব্রহ্মাণ্ড যেহেতু অবাস্তব, কাজেই তার জন্মমৃত্যুর প্রশ্ন নেই। শঙ্কর এটা মানেননি। তিনি দড়ি ও সাপের তুলনা দিয়েছেন। দড়িকে আমরা সাপ বলে ভুল করতে পারি। এই যে আমাদের ভ্রমটা, ভ্রম হিসাবে তো তার অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্কও তাই। ফলে ব্রহ্মাণ্ড একই সঙ্গে বাস্তব এবং অবাস্তব। ব্রহ্ম সত্য (existent) বটে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড তা বলে অসত্য (non-existent) নয়, তা হল মিথ্যা (illusory)। একই সঙ্গে বাস্তব ও অবাস্তব হওয়ায় শঙ্করের অধ্যাসবাদ (Theory of Superimposition) অনুযায়ী বস্তুজগতের প্রকৃত অবস্থা অনির্ণেয়। শঙ্করের অধ্যাসবাদই হচ্ছে অদ্বৈত বেদান্তের অনিশ্চয়তা সূত্র, যা থেকে আগে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে এই হল অদ্বৈত বেদান্তের বিশ্বতত্ত্ব। এইবারে পাপপুণ্য, পুনর্জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে এই দর্শনের ব্যাখ্যাটা সেরে নেওয়া যাক। জীবের দেহটা হল স্থূল শরীর। এর ভিতরে আছে সূক্ষ্ম শরীর। তার মধ্যে আছে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি দিয়ে গঠিত অন্তঃকরণ। এর মধ্যে থাকে জীবাত্মা। প্রতিবিম্ববাদ অনুযায়ী বহু পুকুরে যেমন সূর্যের বহু প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি, বিভিন্ন জীবের অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ে জীবাত্মা গঠিত হয়। উপাধিবাদ অনুযায়ী মহাকাশের একটা অংশ ঘটের মধ্যে যেমন ঘটাকাশ হয় আর ঘট ভাঙলেই মহাকাশে মিশে যায়, ব্রহ্মের অংশ অন্তঃকরণে আবদ্ধ হয়ে তেমনি জীবাত্মার সৃষ্টি করে। অন্তঃকরণের উপর ব্যক্তির ছাপ পড়ে, যাকে বলে কর্মাশয় বা সংস্কার। এই ছাপ মুছে গেলেই অন্তঃকরণ ভেঙে যায়, ফলে মোক্ষলাভ হয়। সংস্কারের সৃষ্টি হয় কর্ম দিয়ে। আসক্তি সহকারে যে কাজ করা হয়, তাই কর্ম। এর মধ্যে পাপপুণ্যের কোনও ব্যাপার নেই। কর্মকে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর যে অংশ একটা জন্মগ্রহণ করতে লাগে তা প্রারব্ধ। যা বাকি থাকে তা সঞ্চিত কর্ম। এক জন্মে সঞ্চিত কর্মে নতুন যে অংশ যুক্ত হয়, তা ক্রিয়মাণ কর্ম। নিষ্কামভাবে কাজ করে গেলে ক্রিয়মাণ কর্ম হয় না। এভাবে আস্তে আস্তে কর্মের পরিমাণ কমতে থাকে। যখন শূন্য হয়, তখন অন্তঃকরণ ভেঙে যায় এবং জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশে যায়। জীবাত্মা যেহেতু পরমাত্মারই অংশ, কাজেই ভগবানের নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রশ্ন নেই।

উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত জীবাত্মা-তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। এটা দেওয়া হল শুধু এটুকু দেখানোর জন্যে যে বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাচীন দর্শনকে টানলেই আমাদের ধর্মের জুজু দেখার দরকার নেই। অনেকে অস্তির বদলে নাস্তিতে বিশ্বাস করে নাস্তিক হয়। অদ্বৈত বেদান্ত যুক্তির পথ ধরে নাস্তিকতায় যায়—কারণ ভগবানও যে মায়া মাত্র, বস্তুজগতের মতই অনিত্য ও 'মিথ্যা'! সেই অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য 'বিবেকচূড়ামণি' বইতে বলে গেছেন,—

I am God. I do not recognize the hell. I do not recognize the three worlds of heaven, hell and earth. I am the Lord, the Controller. I am the unbroken whole. I am still the witness after everything else is dissolved. Nobody else is God for me; nobody else controls me. I am I-less; I am my-less.

('মায়া ইন ফিজিক্স'-এ উদ্ধৃত)

এর চেয়ে বড় নাস্তিকতা আর আছে কি ? বস্তুবাদী নাস্তিক ভগবানকে অস্বীকার করে নাস্তিকতায় যান। অদ্বৈত বেদান্ত একটি ভাববাদী দর্শন, যা ভগবানকে স্বীকার করেও নাস্তিক। যুক্তির পথ ধরে এই দর্শনের চিন্তাবিদ্‌রা বিশ্বতত্ত্বের কিছু ব্যাখ্যায় উপনীত হয়েছিলেন, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান আজও ধন্দে আছে। সেই কারণে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে অদ্বৈত বেদান্ত আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

অঙ্কন : অনুপ রায়